সমুদ্র ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সমুদ্রের অধিকারে

বর্ষ : ১ ত্রৈমাসিক, সংখ্যা ৩ জুন, ২০০৯ দাম ২ টাকা

গত কয়েক বছরের মতো এবারেও ৫ জুন উপলক্ষে পরিবেশ বার্তা ঘোষিত হয়েছে যার মূল কথা 'পৃথিবী তোমারে চায় — অবাঞ্ছিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জোট বাঁধো'। বিশ্ববাসীর কাছে পরিবেশ সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান ১৯৭৪ সাল থেকে ক্রমাগত ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট যে পৃথিবীর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি পরিবেশ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আজও এক হতে পারেনি। জোহানেসবার্গ সম্মেলন থেকে পরবর্তী স্তরে নানা আলোচনা হলেও আমেরিকা, চিন, জাপান, ভারত ও ইওরোপীয় অন্যান্য দেশ অবাঞ্ছিত জলবায়ুর পরিবর্তনের অন্যতম কারণ কার্বন হ্রাসের ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। উপরন্তু কার্বন বাণিজ্য নামক একটি অদ্ভুত তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে উষ্ণায়নের ক্রমবর্ধমান চেহারাটিকে আরও সুস্পষ্ট করছে। অবাঞ্ছিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার শর্ত কী হতে পারে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তরে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। যত বেশি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ঘটবে তত বেশি পরিবেশ দূষিত হবে — এই সাধারণ তত্ত্বটিকে মেনে নিলে পৃথিবীর নানান প্রান্তে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তত ন্যায্য বণ্টন অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় পারস্পরিক বোঝাপড়া অস্পষ্ট থেকে যায়। ধনী দেশগুলি গড়পরতা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হতে চাইছে না। অন্যদিকে ভারত ও চিনের মতো বিশাল জনবহুল রাষ্ট্রগুলি সামগ্রিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রেখা মানছে না। কারণ তাদের যুক্তি মাথা পিছু ভারত বা চিনের মানুষ অত্যন্ত সীমিত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে ধনী দেশের তুলনায়। ফলত দারিদ্রের প্রান্তিক সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা জনগণের কাছে কার্বন হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। তাই আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিবেশ বার্তা ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে। কোনও বার্তাই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারছে না। পৃথিবীর ভোগ্য বস্তু উৎপাদন ও তার ন্যায্য বা সুষম বণ্টনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ বার্তার গুরুত্ব থাকে না।

পৃথিবী অসুস্থ - চাইছে তোমার বন্ধুতা

সোমা বসু

দিনরাত গরমে হাঁসফাস অবস্থা। তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে অনেকদিনই। আজকাল গরম মানেই পারদের মাত্রা লাফাবে আরও খানিকটা। সঙ্গে থাকছে পশ্চিমা বাতাস, তাপপ্রবাহ। বন্ধ মেঘ তৈরি। বৃষ্টি নিয়েছে ছুটি। অনিয়মিত কালবৈশাখী — বদলাচ্ছে চরিত্র। ট্রেনা বিকেল ছেড়ে হানা দিচ্ছে অন্য সময়, হঠাৎ ভোরবেলায় বা রাতের বেলায়ও। ক্রমশ সম্ভাবনা কমছে তারও। বিজ্ঞানীরা বলছেন কারণ - উষ্ণায়ন। পাড়ার পুকুর বুজিয়ে বহুতল ফ্ল্যাট, পাশের ছোট্ট একটিলতে পোড়ো জমির জঙ্গল সাফ করে ক্লাব। হারিয়ে গেল সাপ-ব্যাঙ, কতশত জীববৈচিত্র্য। বাড়-বাড়ন্ত মশারের। পরিবেশ ধ্বংসে, দূষণ, গাড়ির ধোঁয়া, ঠাণ্ডা মেশিন ইত্যাদি ইত্যাদি - সবাই মিলে মিশে কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়েছে অনেকটাই। ফলাফল - গ্লোবাল ওয়ার্মিং। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি সাধারণভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নামে পরিচিত হয়ে গেছে। ধরিত্রীর উষ্ণায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় একটু অন্যরকম। উষ্ণায়ন একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা - যার অভিজ্ঞতা আছে অতীত পৃথিবীরও।

ইতিহাসে গ্লোবাল ওয়ার্মিং

অতীত পৃথিবীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বার বার ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। ধ্বংস হয়েছে অনেক জনপদ - প্রজাতির বিলুপ্তি। মানবজাতির উৎপত্তির মূলেও রয়েছে পূর্ব আফ্রিকায় আকস্মিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। আবার, পৃথিবী থেকে যখন যে দশটি সভ্যতা লোপ পেয়েছে তারও কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন। প্রচুর বৃষ্টিপাতের বদলে খরা, বনজঙ্গল শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যার অন্যতম উদাহরণ সিন্ধু সভ্যতা। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বদলে গিয়েছিল মৌসুমি বায়ুর গতিপথ। ঠিক এমনটাই আবারও ঘটতে পারে ভারতে, পালটে যেতে পারে মৌসুমি বায়ুর গতিপথ। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষির আকার সিংহভাগটাই বৃষ্টি নির্ভর - যা বিনা একাস্তই মৌসুমি বায়ুরই কারণে হয়ে থাকে। ফলে কমবে খাদ্য উৎপাদন, দেখা দেবে খাদ্যসংকট।

পৃথিবীতে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারেই। বরফ যুগ (যখন পৃথিবীর বেশির ভাগটাই ছিল বরফে ঢাকা) থেকে শুরু করে বরফ পরবর্তী যুগ (এই সময় বেশির ভাগ বরফ গলে গেল - রইল বাকি শুধু দুই মেরু) - সুদূর অতীত থেকে বর্তমান অব্দি এই পরিবর্তনের পালা

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

নিয়ত প্রবহমান। বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো সেই ইতিহাস অনেক খুঁজে হাজির করেছেন। Ice cores, boreholes, tree ring, glacier-length changes, earth's orbit around the Sun, ocean sediments প্রভৃতি দলিল ঘেঁটে উদ্ধার হয়েছে এইসব তথ্য। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমুদ্রেরও হয়েছে উত্থান-পতন। বরফযুগের কারণে সমুদ্রের জলতল নেমে গেছে। শেষ বরফযুগ শুরু হয় প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে। মাত্র ১১ হাজার বছর আগে পৃথিবীর দুই মেরুতে যে পরিমাণ বরফ ছিল, এখন আছে তার অর্ধেক। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, গত ৫০ বছরে সুমেরুর ১৩০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বরফ গলে গেছে। বাড়ছে সমুদ্রের জল। সুমেরুর বরফ এই হারে গলতে থাকলে প্রতি শতাব্দীতে জলতল ১মিটার হারে বাড়বে। হিমবাহগুলোও গলছে। সায়েন্স পত্রিকায় প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে এই শতাব্দীর শেষে সমুদ্রের জল ১.৪ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। ডুবে যাবে পৃথিবীর উপকূলবর্তী বহু শহর। প্রভাব পড়বে সমুদ্রের স্রোতের ওপর - ফলাফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঝড়ের তীব্রতা বাড়বে আরও। বিজ্ঞানীদের কাছে রয়েছে গত ৬,৫০,০০০ বছরের হিসেব।

গত দুই হাজার বছরের ইতিহাস বলছে আগ্নেগিরির অগ্ন্যুপাতে যে এরোসলের নির্গমন হয়, তাতে ভূপৃষ্ঠে দেখা দিয়েছিল a year without summer। সালটা ১৮১৬। ইন্দোনেশিয়ার তাম্বোরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের ফলে যে পরিমাণ এরোসল আবহমণ্ডলে মিশেছিল তা সূর্যালোক আড়াল করে ভূপৃষ্ঠে ঘটিয়েছিল সাময়িক শীতলীকরণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন গত দুই হাজার বছরে জলবায়ু মোটামুটি ভাবে স্থিতিশীল ছিল। ব্যাপক রদবদল ঘটেনি। যদিও ৯০০-১৩০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আজকের গ্রিনল্যান্ড তুলনামূলক ভাবে একটু গরমই ছিল। পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রা কমে অনেকটাই। গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, ১৮৬০-১৯০০ শুধু এই কয় বছরেই পৃথিবীর মাটি আর সাগরের তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ১০০ বছরে মানুষেরই কার্যকলাপে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ এতটাই বেড়েছে যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়েছে অনেকটাই।

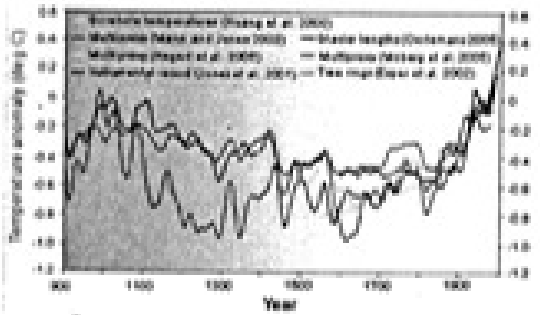

বিগত ১০০০ বছরে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির রেখাচিত্র

এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি বিশেষ কোনও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। গোটা পৃথিবী জুড়েই এর প্রভাব দেখা দিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে সমুদ্র জলের উষ্ণতাও। তথ্য বলছে শুধু গত তিন-চার দশকেই তাপমাত্রা যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিগত চারশ বছরেও বাড়েনি। ৯০০ সাল থেকে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২০ বছরেই বিশেষ কতকগুলো অঞ্চলের তাপমাত্রা বেড়েছে বেশ খানিকটা। পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়নের হার সর্বত্র সমান নয়। জলের তুলনায় স্থল গরম হয় বেশি। সমুদ্রের তাপধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। সমুদ্রজলের বাষ্পীভবনের মাধ্যমে কমে তাপমাত্রা। তাই দক্ষিণ গোলার্ধের (এখানে জলের পরিমাণ বেশি) তুলনায় উত্তর গোলার্ধের উষ্ণায়ন হার অনেক বেশি। এখানে স্থলের পরিমাণ বেশি। তাই বিপদে পড়তে চলেছে এই গোলার্ধ।

গত মধ্য বিংশ শতাব্দী থেকে ভূপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাস এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনও যেভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তা নজিরবিহীন। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গত শতাব্দী ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৭৪ যুক্ত ০.১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস - যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। উষ্ণায়নের পেছনে রয়েছে গ্রিন হাউস গ্যাস। উষ্ণায়ন যদিও একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা, সোলার ভেরিয়েশন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি নানান প্রাকৃতিক ঘটনাতেও উষ্ণায়ন হয়। কিন্তু, চল্লিশটির বেশি বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং বিজ্ঞান আকাদেমি সমস্ত তথ্য, প্রমাণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উষ্ণায়নের পেছনে প্রাকৃতিক এই সব কারণকে সামান্য বলে মূলত দায়ী করেছে An Thropoggenic Green House Gases — অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসকে। প্রকৃতিতে নানান প্রাকৃতিক ঘটনার জন্য যে সব গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হয় - তার প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ গরম হয় মাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মজার কথা এই তাপমাত্রার কারণেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব। অর্থাৎ এই তাপমাত্রা না থাকলে এই সৌরজগতের/মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহগুলোর মতোই পৃথিবীও হত বসবাস অযোগ্য একটি ঠান্ডা গ্রহ।

বস্তু	গ্রিন হাউস গ্যাস
জলীয় বাষ্প	৩৬-৭০ শতাংশ
কার্বনডাইঅক্সাইড	৯-২৬ শতাংশ
মিথেন	৪-৯ শতাংশ
ওজোন	৩-৭ শতাংশ

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবী জুড়ে মানুষ যেভাবে পরিবেশের ধ্বংস ঘটিয়েছে তাতে আবহমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, ওজোন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর পরিমাণ ও বিকিরণের ক্ষমতা মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। সতেরোশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড ও মিথেন এর গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬-১৪৮ শতাংশ যা কিনা বিগত ৬,৫০,০০ বছরের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। **ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ** (আই পি সি সি)-র একটি বিশেষ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে Fossil fuel burning, land-use change, deforestation মূলত এই তিন কারণেই লুকিয়ে আছে উষ্ণায়নের ইতিহাস, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে মানুষ যেভাবে পরিবেশ ধ্বংস করেছে এবং করে চলেছে তারই ফলাফল এই উষ্ণায়ন। শিল্পবিপ্লবে কল-কারখানা বেড়েছে, বেড়েছে দূষণ, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন। ফলে অবিরাম বনভূমি ধ্বংস। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে জঙ্গল সাফ করে কৃষিজমি। হারিয়েছে জীববৈচিত্র্য, ধানের খেত বাড়িয়ে মিথেনের পরিমাণ। এত গাড়ি, বাড়ি, এদেশ-ওদেশ ছোটাছুটির হাওয়াই জাহাজ, ঠান্ডা মেশিন - সবাই মিলেমিশেই নিয়ে এসেছে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন - গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে মূলত যদিও ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের উষ্ণায়ন

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

বোঝায় কিন্তু একই সঙ্গে তা জলবায়ুর পরিবর্তনের-ও একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ। জলবায়ু শব্দটির ব্যাপ্তি গভীর। ইদানিংকালে মানুষেরই কারণে ধরিত্রী উত্তপ্ত, সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, গলছে হিমবাহ। দক্ষিণ ও উত্তর মেরুর বরফ গলনের ফলে বিপন্ন হচ্ছে ওখানকার জীববৈচিত্র্য। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ মেরু ভালুকেরই অস্তিত্ব লোপ পাবে। জলবায়ুর পরিবর্তনে বদলাচ্ছে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় - সব কিছুরই চরিত্র। ঘটছে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ, হ্যারিকেন, টর্নেডোর মতো ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ের ঘন ঘন হানা। জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের কারণে কত শত প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। আবার পরিবেশের পরিবর্তনে অনুকূল বিকাশ ঘটছে বেশ কিছু অসুখের ভেক্টরের। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য ক্রান্তীয় রোগ ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবী জুড়ে। **দ্য এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি** —আমেরিকার একটি বিখ্যাত সংস্থা, সম্প্রতি মেপেছে আবহমণ্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইড ও আরও ৫টি গ্রিন হাউস গ্যাস। ওদের ঘোষণা: all are endangered - public health and welfare। এরা সরাসরি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে জলবায়ুর, বাড়াচ্ছে তাপপ্রবাহ, বন্যা ও খরা - যাতে ভবিষ্যতে ব্যাহত হবে খাদ্য ও জলের জোগান।

পরিবেশবিদরা বলছেন যেভাবেই হোক কমাতে হবে কার্বনডাইঅক্সাইডের উৎপাদন। বললেই কি হবে! বড়রা কথা শোনে না মোটেই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সম্মেলন করে, প্রোটোকল বানায় - কিন্তু মানে না। ভাবে না ভবিষ্যতে কী হবে ছোটদের? আমরা খুশি এ টি এম এর ঠান্ডা ঘরে যখন তখন টাকা তুলতে পেরে। যাদের টাকা নেই, এ টি এম নেই - তাদের কথা ভাবার সময় নেই (ওদের)। কথা ভাবা আজকালকার সংস্কৃতিতে নিয়ম নয়! দেখতে দেখতে সর্বত্র এসি-র বাড়-বাড়ন্ত, অফিস, স্কুল-কলেজ, গাড়ি-বাড়ি, এমনকী মুদির দোকান, গুহ্ নো: ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। কার্বনডাইঅক্সাইড, সিএফসি ইত্যাদির ভিড়। এত সব যাচ্ছে কোথায়? যাচ্ছে পরিবেশে। জমছে আবহমণ্ডলে - পরিবর্তন ঘটাচ্ছে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় - সব, সব কিছুরই।

উষ্ণায়নের পিছনে বিভিন্ন ফিডব্যাক কাজ করে। যখন কোন জিনিস গরম হতে থাকে, তার মানে সেই জিনিসটি পরে আরও কিছুক্ষণ ধরে গরম হবে, এ রকমই ইঙ্গিত বহন করে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে পজিটিভ ফিডব্যাক। উষ্ণায়ন প্রবণতার একটি প্রধান পজিটিভ ফিডব্যাক হল আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। বিজ্ঞান বলছে, যদি আবহমণ্ডল গরম হয়, তবে বাড়ে **স্যাচুরেশন ভেপার প্রেশার**। যার ফলে আবহমণ্ডলে বাড়ে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা। জলীয় বাষ্প একটি অতি বিপজ্জনক গ্রিন হাউস গ্যাস। এর ফলে শুধু আবহমণ্ডলেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না, পাশাপাশি আবহমণ্ডলে আরও বেশি পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করবে (পজিটিভ ফিডব্যাক)। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখেছেন এর ফলাফল কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের চেয়েও সাংঘাতিক। মেঘের দুইরকম ক্ষমতা - উষ্ণায়ন ও শীতলীকরণ। পৃথিবীর বুকে ইনফ্রারেড রশ্মি বিচ্ছুরণ ঘটায় মেঘ। ফলে ঘটে উষ্ণায়ন। আবার, মেঘ সূর্যালোক প্রতিফলিত করে মহাকাশে —এই কারণে হয় শীতলীকরণ। কিন্তু, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণে বদলে যাচ্ছে মেঘের চরিত্র ও বিস্তৃতি। ফলে, এতদিনকার এই নিয়ম আর চলছে না। শুরু হয়েছে অনিয়মের খেলা - যাতে উষ্ণায়নের পাল্লা হচ্ছে ভারী। মানুষের তৈরি দূষণে তৈরি হয় গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বনডাইঅক্সাইড। সঙ্গে থাকে এরোসল (এমনিতে এরোসল নন গ্রিন হাউস গ্যাস)। বিজ্ঞানী জেমস্ হ্যানসেন এবং তার সহকর্মীরা গবেষণা করে দেখেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর এক প্রধান আসামী এই এরোসল। সাধারণত এরোসলের ভূমিকা সূর্যালোক শোষণ ও বিক্ষিপ্তকরণের (solar scatters & absorbtions) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জৈব-জ্বালানিতে থাকে নানান জিনিস (welfare)। ফলে দহনের পর সালফারডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, যা আবহমণ্ডলে গিয়ে অক্সিডাইজড্ হয়ে তৈরি করে সালফেট। এটি হিসেবে cloud condensation nuclei-এর কাজ করে। ফলে drizzle তৈরি হয় অনেক কম (Twomey effect-এর বিপরীত) - যা মেঘগুলোকে পৃথিবীতে বেশি সূর্যালোক প্রতিফলিত করে তুলছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে। উষ্ণায়নের কারণ ও ফলাফল নিয়ে তো অনেক কিছু বলা হল, এবার দেখা যাক মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এর কী প্রভাব পড়ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পড়তে চলেছে। National Centre for Atmospheric Research (USA)-এর এক সাম্প্রতিক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে - গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রভাব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করবে।

- সমুদ্রতলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর ১০ কোটি লোক বন্যায় গৃহহারা হবে।
- সুন্দরবন বদ্বীপ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ডুবে যাওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিবেশ শরণার্থী হবেন। হারাবেন বাসস্থান ও জীবিকা।
- খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হবেন শত-কোটি মানুষ। (গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণে বদলে যাবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব জনিত বৃষ্টিপাতের ধরনধারণ, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আকাশ থাকবে মেঘলা। তাতে গরম বাড়বে, কমবে সূর্যালোক। সবাই মিলে কমিয়ে দেবে কৃষি উৎপাদন।) ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর প্রায় ২০-৩০ কোটি লোকের মুখে খাদ্য জুটবে না। মিলবে না পানীয় জল।
- সমুদ্রের জলের পি এইচ কমবে, কমবে অক্সিজেনও। ফলে, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিনষ্ট হবে বাস্তুতন্ত্র - যা পরোক্ষে খাদ্য সংকট তৈরি করবে।
- সমুদ্রের তল উপরে উঠবে। নোনা জল ঢুকে কৃষি জমি নষ্ট হবে, দেখা দেবে পানীয় জলের সংকট।
- তৈরি হবে নানান স্বাস্থ্য সমস্যা। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, ডায়েরিয়া, লাইম ডিজিজ ও নানা অ্যালার্জির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
- উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অসুখ (tropical diseases) ছড়িয়ে পড়বে শীতপ্রধান অঞ্চলে।
- গৃহহারা, স্বজনহারা এইসব শরণার্থীদের থাকবে বিভিন্ন শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা, physical wounds ছাড়াও PTSD (Post-traumatic stress disorder) এবং মানসিক অবসাদ। দিনরাত সঙ্গী হবে সব কিছু হারানোর যন্ত্রণা।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে মানসিক স্বাস্থ্যের বিপন্নতার

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

কারণে চিকিৎসা খাতে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের রোগীদের মধ্যে PTSD-এর লক্ষণ হিসেবে নিদ্রাহীনতা, মানসিক অস্থিরতা (anxiety), ক্লান্তি (chronic fatigue), স্মৃতিভ্রংশ, কর্ম-অক্ষমতা অর্থাৎ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা ইত্যাদি থাকবে। ফলে, এরা স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের চেনা ছন্দ হারাবে। যার সামগ্রিক ফলাফল পড়বে দেশের উন্নতিতে এবং অর্থনীতিতে। এক বিশাল পরিমাণ অর্থ খরচ হবে এইসব লোকের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা খাতে। যার প্রভাবে, বাকি সুস্থ লোকদের ওপরেও পড়বে অর্থাৎ প্রথমত ও শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হব।

তাই যে কোনও ভাবেই রোধ বন্ধ করতে হবে অতিরিক্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন। কমাতে হবে কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন ও ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বনডাইঅক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর পরিমাণ আবহমণ্ডলে এমন একটি বিপজ্জনক মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে যে এই মুহূর্তে যদি সমস্ত গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন ও নিঃসরণ বন্ধও হয়ে যায় তাহলে শুধু আজ পর্যন্ত যে পরিবর্তন জলবায়ুর হয়েছে তাতে আগামী এক শতাব্দী জুড়ে চলবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া।

এ বছর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ সংস্থা। পৃথিবী আজ মেনে নিয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়নের ঘটনা। কারণ বৃহৎ পুঁজির অতিরিক্ত লাভের লোভ। বৃহৎ পুঁজিপতি শক্তিধর রাষ্ট্রের দাপটে অন্যান্য রাষ্ট্রনেতারা আজ নির্বাক পুতুল। বিকল্পের কথা গুরুত্ব পাচ্ছে না। কিয়োটো প্রোটোকল তো কবেই পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। বিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা ক্লান্ত। আমরা ক্লান্ত আসলে কিছু মানুষের আধিপত্যবাদে, সর্বগ্রাসী ভোগবাদী মানসিকতায়। গ্লোবালাইজেশনের ফলে গোটা বিশ্ব ১৯৭২ সালের পর থেকে ইউজ অ্যান্ড থ্রো সংস্কৃতিতে ক্রমশ অভ্যস্ত। প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে আমরা এক অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

আজ পৃথিবীর গভীর অসুখ, তাইতো, চাইছি তোমার বন্ধুতা। কারণ, তোমার সচেতনতা, যত্ন, দায়িত্ব, ভালবাসাই একমাত্র পারে এই পৃথিবীকে ভাল করতে, ভাল রাখতে।

আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল : সাম্প্রতিক পরিবেশ ভাবনা

ডঃ অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়

সময় গড়িয়ে চলেছে দ্রুত। বাহ্যিক পরিবর্তনের সঙ্গে, বলা ভাল পরিবর্তনের ধরনের সঙ্গে নতুন করে অভিযোজিত হতে হচ্ছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে। পরিবর্তনের যে ধারা তা যেমন গোটা পৃথিবীতে সমভাবে বিকশিত হয়নি, ঠিক তেমনই যাকে 'উন্নয়ন' বলে চিহ্নিত করা হয়, তাও কিন্তু সব মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছয়নি। এটা লক্ষণীয় যে পৃথিবীর যে উন্নয়ন ও বিকাশের ধারা তা কিন্তু অনেক বেশি করে চোখে পড়ে এমন কিছু অঞ্চলে যেখানে কিনা প্রকৃতিতে সম্পদ বিনষ্ট করা হয়েছে সব থেকে বেশি। তাই এই মতটি বেশ জনপ্রিয় যে, যে দেশ যত বেশি ইকোনমিক্যালি রিচ্ সেই দেশ ততই ইকোলজিক্যালি গরিব। আবার একইভাবে উল্টোটাও সত্যি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে পাশ্চাত্যের যে দেশগুলি নির্বিচারে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধ্বংসে মদত দিয়ে এসেছে আজ তাদেরই পরিবেশ দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে — 'No humanity without nature'। উল্টোদিকে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার এক ব্যাপক দেশসমূহের মানুষের কর্মহীনতা, খাদ্যাভাব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি এক সাংঘাতিক বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জনসংখ্যার প্রবল চাপ তো আছেই, তার সঙ্গে আছে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক বার্তা। বলা হচ্ছে ২০৫০ সালে গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯৩০ কোটি। তার মধ্যে ভারতবর্ষেই থাকবে গোটা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ। উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের চিন্তানায়করা কিন্তু পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে তাদের দর্শন হিসাবে বলতে শুরু করেছেন যে 'No nature without social justice'। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তাটাও একইভাবে সমান জরুরি। এই মুহূর্তে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ-প্রতিবেশ নিয়ে টানাপোড়েন চলছে নিরন্তর।

কয়েকটি জরুরি তথ্য

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আমরা যে ঘটনাটি নিয়ে চিন্তিত, বলা ভাল উদ্বেলিত, তা হল উষ্ণায়ন। অর্থাৎ আমাদের ধারক ও বাহক এই পৃথিবী, যার ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে আমরা বিভিন্ন দেশের সীমানা নির্দিষ্ট করেছি — তা উষ্ণতর হচ্ছে। বিস্তারিত ভাবে তার কার্যকারণ জানার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই আমরা জেনে ফেলেছি গ্রিন হাউস গ্যাসের কথা। আলোচনা চলছে নানা স্তরে। শক্তির ব্যবহার, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে চলছে ভাবনা, বিতর্ক। তবু যেন চিন্তা বেড়েই চলেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়েই চলেছে। নতুন নাম নিয়ে ঝড় ধেয়ে আসছে বারবার। সাম্প্রতিক সময়ে কখনও এল নিনো, লা নিনা, রিটা, ক্যাটরিনা, নার্গিস, সিডার, বিজলি বা আয়লা মতো অভিজ্ঞতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সমুদ্রের জলের স্তর বাড়ছে। একটু একটু করে তা প্লাবিত করবে নিচু সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিকে। বলা হচ্ছে প্লাবিত হতে পারে ভারতবর্ষ, ভিয়েতনাম, চিন, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশের বিশাল ভূখণ্ড। তৈরি হবে 'পরিবেশ শরণার্থী' (environmental refugee)। প্লাবিত হবে কৃষিজমি। ক্ষতি হবে পানীয় জলের। প্রাদুর্ভাব হবে নতুন অসুখের - বিশেষত ভেক্টর বাহিত এবং জলবাহিত অসুখের। টান পড়বে খাদ্যভাণ্ডারে। কৃষি বা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। নদী-খাল-বিলের জল হয়ে পড়বে লবণাক্ত অর্থাৎ স্বভাবেই গোটা সভ্যতা এক চূড়ান্ত সঙ্কট ও আশঙ্কার মুখোমুখি। এক ঝলক কয়েকটি তথ্যে আমরা চোখ বুলিয়ে নিই।

এক : গত ১৩০ বছরের মধ্যে উষ্ণতম ১২টি বছর আমরা পেয়েছি ১৯৯৫ সালের পর থেকে।

দুই : শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮০ পি পি এম যা কিনা এই মুহূর্তে ৩৭৯ পি পি এম। এই মুহূর্তে প্রতি বছর এটি বাড়ার হার হল ১.৫ পি পি এম।

তিন : আমেরিকায় গোটা পৃথিবীর ৫.৬ শতাংশ লোক থাকে। যারা মোট সম্পদ ভোগ করে প্রায় ৪০ শতাংশ। আর গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি করে প্রায় ২৫ শতাংশ।

চার : ভারতবর্ষের জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় ১৬.৫ শতাংশ। পৃথিবীর উৎপাদিত গ্রিনহাউসের ৫ শতাংশ তৈরি করে আমাদের দেশ।

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

পাঁচ : গত শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ০.৬ - ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে।

ছয় : বর্তমানের গ্রিন হাউস গ্যাসের উৎপাদন যদি চালু থাকে, তাহলে আগামী একশো বছরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

সাত : মোট যা গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হয় তার প্রায় ৬৫ শতাংশ তৈরি হয় শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে।

আট : মাথা পিছু কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ভারতবর্ষে যদি হয় ১.১৯ একক, তাহলে আমেরিকায় তা দাঁড়ায় ১৯.৯০ একক।

নয় : প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১০ শতাংশ বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দশ : ২০৩০ সালে ভারতবর্ষে মোট শক্তির চাহিদা দাঁড়াবে ৬০০,০০০ মেগাওয়াট।

এগারো : একবিংশ শতাব্দীতে প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন কমতে পারে যদি উষ্ণায়নের ধারা অব্যাহত থাকে।

বারো : সমগ্র পৃথিবীতেই, পশু, পাখি, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, পোকামাকড় ইত্যাদির মধ্যে আচরণের পরিবর্তন খেয়াল করা যাচ্ছে। তাদের পরিযান (migration) ও বিস্তারের (distribution) এর ওপর উষ্ণায়নের প্রভাব ভালভাবেই পড়েছে।

তেরো : সারা পৃথিবীতেই বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে চলেছে। বাড়ছে মরুভূমির পরিমাণ। চূড়ান্ত পরিস্থিতি যেমন খরা বা বন্যা বেড়ে চলেছে।

চৌদ্দ : পরিবর্তিত হচ্ছে অরণ্যের বিস্তার। আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে অরণ্যের পরিবর্তিত গুণগত মান।

পনেরো : ইতিমধ্যে ইওরোপে বসন্ত এক সপ্তাহ এগিয়ে এসেছে। সারা পৃথিবী যেন ঋতুচক্রের দোলাচলে আক্রান্ত।

এসব দেখে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে এ পৃথিবী এখন এক গভীর অসুখে আক্রান্ত এবং এ অসুখ ধর্ম, জাতি, দেশ, বর্ণ নিরপেক্ষ। এলোমেলো হয়ে যাওয়া জলবায়ুর পরিবর্তন, সর্বোপরি যে উষ্ণতর পৃথিবী নতুন সমস্যা নিয়ে আমাদের সামনে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে উন্মোচিত করছে তাতে মানবজাতির প্রতিটি সদস্যই যে আশঙ্কিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সমাধানের পথেও অগ্রসর হতে হবে সবাইকে মিলে। যদিও এ কাজ করে দেখানো যথেষ্ট কঠিন। পৃথিবীর এলাকাভিত্তিক খণ্ড স্বার্থ তাকে শরীরে ও মননে খণ্ড করে ফেলেছে। তাকে অতিক্রম করা সহজ কাজ নয়। তাই উন্নত দেশগুলি তাদের দায়িত্ব পালনে এত দ্বিধাচিত্ত। তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক আকাঙ্ক্ষা তাদের কাছে অনেক জরুরি। অথচ তারাও যে সমস্যা সম্পর্কে অবহিত নন এমনটা নয়। নতুন ভাবে ভাবনা উন্মোচিত হয়ে চলেছে। ভাবনা চলছে কীভাবে পরিবর্তিত জলবায়ুর খামখেয়ালিপনা ও উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক মনন, মানুষের জীবন-জীবিকা, কৃষি-নিরাপত্তা, শক্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে একটি সংহত রূপ দিতে পারি। একথা অনস্বীকার্য যে ক্রমশ সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছেন। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ চলছে। এই উদ্যোগে যদি সাধারণ মানুষের সার্বিক অংশগ্রহণ ঘটে তবেই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে সমগ্র উষ্ণায়ন বিরোধী ব্যবস্থাপনা।

ইদানিং অনেক নতুন পরিভাষার সঙ্গে আমরা নতুন করে পরিচিত হচ্ছি। যেমন- CDM, Carbon sequestraation, Carbon credit, Low carbon economy ইত্যাদি। মূল সমস্যার কারণ খোঁজার সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থাও ভাবতে হবে। গবেষণা ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সব থেকে জরুরি হল পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশলের প্রয়োগ (adaptation strategy)। শুধু সচেতনতা দিয়ে বোধহয় আর হবে না। প্রয়োজন নতুন বিধি ও নিয়মের কঠোর প্রয়োগ। সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে দরকার Noo- system (Noo-গ্রিক শব্দ, এর অর্থ মানুষের চেতনা) এর যথার্থ প্রয়োগ। মানুষের জীবন ও তার তথাকথিত 'মান' আর একটু সরলীকৃত হতে পারে। শক্তির ব্যবহার কমাতেই হবে। উদ্ভাবন করতে হবে পরিবেশ বান্ধব শক্তিসমূহের। 'উন্নয়ন' শব্দের আন্তর্জাতিক পুনর্মূল্যায়ন দরকার। সবুজকে বাঁচাতে হবে। সুস্থ পরিবেশের অধিকারকে দেশ, জাতি ও বর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। সর্বোপরি মানবজাতি হিসাবে আমাদের দেখাতে হবে মানসিক দৃঢ়তা ও সততা। কাজে ও কথায় এক হতে হবে। অনেক পরিবর্তন, বিবর্তন-এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মহাপৃথিবী। তার ওপর জীবনের উদ্ভব, তার বৈচিত্র্য শুধু অসাধারণ নয়, এক অবাক করে দেওয়ার মতো ঘটনা। তাকে রক্ষা করা ও তার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব আমাদের সবাইকে পালন করতে হবে। শুধু একটা পরিবেশ দিবসের প্রতীকী পালন নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনযাপনের মন্ত্র হোক পরিবেশ রক্ষা।

সবুজ বিবাহ

সুদীপ্ত মোদক

সবুজ বিবাহ নামটা দেখেই বোধ হয় চোখটা আটকে গেল। কেমন যেন চেনা-অচেনা কথা, জানা-অজানা ধারণা। তাই না। কারো কারো মনে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্-এর সেই দৃশ্য ভেসে আসছে যেখানে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা আর তার সহচরীরা মিলে আম্রবৃক্ষে বনজ্যোৎস্না লতার আলিঙ্গন দেখে কল্পনা করছে গাছের সঙ্গে গাছের পরিণয়ের কথা, নয়তো বকুল বৃক্ষের নিচে শকুন্তলার অবস্থান দেখে, প্রিয়ম্বদার কল্পনা যেন শকুন্তলার সঙ্গে বৃহস্পতির বিবাহ। অথবা কারো মনে হতে পারে সেই অপর্ণা সেনের চলচ্চিত্র 'সতীর' কথা যেখানে পুরাণে অরক্ষণীয়া সমাজচ্যুতাকে বাঁচাতে গাছের সঙ্গে বিবাহের বিধান। — না, এই সবুজ বিবাহ ওই গাছে গাছে বিয়ে নয় অথবা মানুষের সঙ্গে গাছের পরিণয়ও নয়। এ একেবারে আধুনিক যুগের হাই প্রোফাইল ঝক্‌ঝকে বিয়ে। আধুনিক মনস্কতায় পরিবেশ রক্ষা করে বিবাহের আয়োজন।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, দিনকে দিন বিয়ের অনুষ্ঠান এর বাহার আর বাহানা দ্রুত যাচ্ছে পাল্টে। সেই শীতল পাটির চাটাইয়ে বসে কলাপাতা আর মাটির ভাঁড়ে জল এখন অনেক মোড় নিয়ে আলোক উজ্জ্বল শব্দ উচ্চকিত ঝক্‌ঝকে রিসেপশন্। সারারাত জেগে পিসেমশাইয়ের সেই ছ্যাচড়া খেটানো আর নেই। আবেগ, ভালোবাসার সঙ্গে, আধুনিক রীতিনীতি মেনে, অপচয় আর অহঙ্কারের ঢক্কানিনাদ ছুটছে বিশেষত একটু সম্পন্ন মানুষের মধ্যে। এই অনুষ্ঠানের রোশনাইয়ে আমি আপনি সবাই গা ভাসিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু কেউ কি আমরা খেয়াল করছি যে প্রকৃতি এর ফলে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এবারের পরিবেশ দিবসের

এর পর ছয়ের পাতায়

পাতার পাতার পর

স্লোগান হল - 'পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে, পৃথিবীকে বাঁচাতে, আমাদের সকলকে এগিয়ে আসার দরকার।

বেশ কিছুদিন যাবৎ, প্রধানত শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমপরিবর্তিত ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রা এবং নির্বিচারি অরণ্য নিধনের জন্য আমরা এক অপ্রত্যাশিত জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছি। যার অন্যতম লক্ষণ হল পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। শেষ বারো বছর তো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে, পৃথিবীর জমে থাকা বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রতল বাড়ছে, জায়গা জায়গায় খরা, বন্যার প্রকোপ বাড়ছে ইত্যাদি আরো কত কত প্রাকৃতিক পরিবর্তন হচ্ছে আর হবে সে তো কম বেশি সকলের জানা। এরেই বিজ্ঞানীরা বলছেন বিশ্বময় উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে মনুষ্য সৃষ্ট কারণ হিসাবে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিকে দায়ী করা হচ্ছে। কার্বনডাইঅক্সাইড অন্যতম গ্রিন হাউস গ্যাস হিসাবে চিহ্নিত। অন্যান্য ওই জাতীয় গ্যাসের মধ্যে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বাতাসে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এই গ্যাস পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়া সূর্যরশ্মিকে আটকে বের হতে দেয় না। আমরা প্রতিনিয়ত সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জেনে অথবা না জেনে, পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গত করে চলেছি। এখন সবাই মিলে এই কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ করে বিয়ে বাড়িতে যে ধরনের আড়ম্বরতা আমরা করে থাকি তাতে করে অনেক বেশি করে কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে মেশে। সরাসরি ওই ভাবে বোঝা যাবে না কেন কার্বনডাইঅক্সাইড মিশছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে একটা জাঁকজমক পূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানে গড়পড়তা ১৪.৫ টন কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়। একটু আন্তরিক, একটু পরিবেশ প্রেমী, আর একটু বুদ্ধিযুক্ত প্ল্যানিং করলে আমাদের পরিবেশটা শুধু বাঁচবে না, অর্থের অপচয়ও কমবে।

শুরু করতে হবে নিমন্ত্রণ লিষ্ট তৈরি থেকে। এমন অতিথিদের বলুন যাঁরা আসবেনেই। যত বেশি অপচয়, তত অযথা বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড। প্রয়োজনে কার্ডে **RSVP** লেখা চলতে পারে। বিয়ের কার্ডটা এমন ভাবে বাছুন যাতে আর কোন অতিরিক্ত খাম না লাগে। বেশি কাগজ মানে বেশি গাছ কাটা, বেশি গাছ কাটা মানে বেশি কার্বন বাতাসে থাকা। সম্ভব হলে ১০০ শতাংশ পি সি ডাব্লু পুনর্নবীযুক্ত কাগজ হলে ভাল হয়। ছাপার মেটালিক কালি, আর পলি-লামিনেশন এড়িয়ে যান। বিয়ে বাড়ি ফুল ছাড়া ভাবা যায়? ফুল কিনুন স্থানীয় জায়গা থেকে। জৈব সার লালিত গাছের ফুল পছন্দ করুন। এবার গ্লেসের পালা। মেটালিক সলমা, চুমকি বাদ দিন। প্রাকৃতিক ফাইবার বা সিল্ক জাতীয় পরিচ্ছদ তৈরি করুন। উৎসব বাড়ি এমন জায়গায় নির্বাচন করুন যা বাড়ির কাছে হয়। দূরত্ব বাড়লে যানবাহন লাগবে অতিথিদের আসা যাওয়ার জন্য, তত জ্বালানি পুড়বে, ততই কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে বাড়বে। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী বহরের জন্য যাত্রী অনুযায়ী একটি মাত্র গাড়ি ঠিক করুন। এখন তো রেওয়াজ হয়েছে উৎসব বাড়িতে পর পর সব চাউস চাউস মোটর গাড়ি লাইন দিয়ে ঢোকার, এতে হয় তো সাময়িক এক আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় আর্থিক সঙ্গতি দেখানোর কিন্তু এতে কত বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ে আমরা কি কেউ হিসাব করে দেখেছি? এর পর অলংকারের কথা। বিয়ে হবে অলংকার থাকবে না তাও কি হয় নাকি? নতুন করে সোনা কিনবেন না। বাড়িতে যা সোনার গহনা আছে তাকেই পুনর্ব্যবহার করুন। বিশুদ্ধ সোনা উৎপাদন করতে পারদ বা সায়ানাইড এর মতো বিষ রাসায়নিক এর দরকার লাগে। সেই দূষক পদার্থগুলি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিতে মেশে। মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশ সোনাই অলংকার তৈরিতে ব্যবহার হয়। হিসাব বলছে মাটির উপরে থাকা স্বর্ণালঙ্কার-এর পরিমাণ আগামী পঞ্চাশ বছরের সোনার চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাই স্বর্ণালঙ্কারের জন্য সোনার উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে পরিবেশ বাঁচাতে হবে। কথায় বলে 'মনি কাঞ্চন যোগ'। কাঞ্চন থাকবে মণিকে তো থাকতেই হবে। প্রাকৃতিক মণি উত্তোলন করতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, আর তাছাড়া এতে ভূমিক্ষয়ও বাড়ে। তাই প্রাকৃতিক পাথর বন্ধ করে কৃত্রিম মণি পছন্দ করুন। ক্যাটারারকে বলুন সহজ পাচ্য খাবার দিতে। যত বেশি তেল, ঘি ব্যবহার হবে, তা তৈরি করতেও তত বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে, যত উৎপাদনে শক্তি তত বেশি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, তত বেশি ওই গ্রিন হাউস গ্যাস। হাল ফ্যাসানের প্লাস্টিকের বা পলিফোমের ডিশ বাদ দিয়ে সবুজ রিঙ্ক কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করুন। খাবারের পদগুলিতে স্থানীয় সব্জি, শস্যের প্রাধান্য যেন বেশি থাকে। অতিথির পাতে বর্ধমানের সীতাভোগ, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, চন্দননগরের জলভরা দিতে কার না ইচ্ছা করে। এবার ভেবে দেখুন আপনার বাড়ি ডায়মন্ডহারবারে হলে ভিন্ন জায়গার মিষ্টি এক জায়গায় আনতে কত বেশি জ্বালানি পুড়বে। এইভাবেই আমাদের অজান্তেই দহন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির, বাতাসে বাড়ছে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ। উৎসবের আলোক রোশনাই সাজান LED দিয়ে। ইলেকট্রিকের লোকতে বলুন সি এফ এল লাগাতে। অযথা জেনারেটর চালিয়ে কেন লোড সামলাবেন। ওয়াটেজ কনজামশন কমান ওই আলোর সম্ভার দিয়ে। প্লাস্টিক বর্জিত সামগ্রী উপহার দিন।

এবার একঘেয়ে লাগছে। বাদ রইল মধুচন্দ্রিমা, আর এক অপচয়। পড়তে পড়তে মনে হতে পারে এ এক পরিবেশ সংরক্ষণের মোড়কে কৃপণতার আখ্যান। না। পকেটে পয়সা থাকলেই তো আর পরিবেশ কলুষিত করার অধিকার আমাদের কেউ দেয়নি।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

সৌম্যকান্তি জানা

এ বছর পুরো এপ্রিল মাস এবং মে মাসের প্রথম দশদিন জুড়ে যে তীব্র দাবদাহে পুড়েছে এ রাজ্য তা আমবাঙালির স্মরণকালে ঘটেনি। কলকাতায় পারদ চড়ে রেকর্ড ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কালবৈশাখীর দেখা নেই। কিছুদিন ধরে আমরা সবাই অনুভব করছি, আমাদের চেনা ঋতুগুলো যেন পাল্টে যাচ্ছে। চেরাপুঞ্জি বৃষ্টিহীন। আবার বন্যায় ভাসছে মরু-রাজস্থান। লন্ডন শহর কখনও গরমে হাঁসফাঁস তো কখনও বর্ষার জলে হাবুডুবু কিংবা তুষারপাতে বিপর্যস্ত। বাড়ছে খরা। বাড়ছে ঝড়-ঝঞ্ঝাও। সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন ঘটছে। উষ্ণতা বাড়ছে সমুদ্রতলের। মিডিয়ার দৌলতে এসব খবর এখন আমাদের জানা।

কিন্তু কেন এই প্রকৃতির রোষ? পরিবেশ বিজ্ঞানী ড.ওয়ালেশ ব্রোকার

এর পর সাতের পাতায়

ছয়ের পাতার পর

একটা সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন -'আবহাওয়া হল একটা ক্ষ্যাপা জন্তু। আর মানুষ তাকে খোঁচাচ্ছে ছুঁচালো একটা লাঠি দিয়ে।' প্রকৃতির সাথে বৈরিতা প্রকৃতি সহ্য করে না। শুরু হয়েছে প্রকৃতির প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। ক্ষ্যাপা জন্তুকে উত্তক্ত করলে যা হয়! মানুষের নানা কর্মকাণ্ডে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফারডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্রিন হাউস গ্যাসই প্রতিনিয়ত খোঁচা দিচ্ছে ক্ষ্যাপা প্রকৃতিকে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে মাটি থেকে বিকিরিত তাপ আটকা পড়ছে। আর এতেই পৃথিবীর উষ্ণতা চড়চড়িয়ে বাড়ছে।

গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হল কার্বনডাইঅক্সাইড ১৬ শতাংশে। কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন এবং নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংসের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০০ বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ০.০২৪ শতাংশে থেকে ০.০৩৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের হিশেবে বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টন অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে সংযোজিত হচ্ছে। এমন চললে শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ৩৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড আছে খুব কম, ০.০৩ শতাংশে। এর পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তবে পৃথিবীর উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। গত ১০০-১৪০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ১.১ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অবশ্য সব জায়গায় সমহারে বাড়বে না। দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমাত্রা বাড়বে কম। আবার মরু অঞ্চলে বাড়বে ১০-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কী হবে তখন? কুমেরুর বিপুল বরফ গলে যাবে। প্রতি দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৬ সেন্টিমিটার করে। ২০২০-৩০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার। ২০৫০ সালে প্রায় ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। ২১০০ সালে প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার। ডুবে যাবে সমস্ত নিচু দ্বীপ ও উপকূল এলাকা। জলতল এক মিটার বাড়লেই পৃথিবীর ৬০ শতাংশে মানুষ তাদের বাসস্থান হারাবে। বিজ্ঞানীদের হিশেব, ভারতের উপকূল এলাকা ডুবে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রায় ৭১ লক্ষ মানুষ। মুম্বাই ও চেন্নাই শহরের পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি হবে ব্যাপক।

উত্তর গোলার্ধে সব চেয়ে বড় তুষারঢাকা দ্বীপ হল গ্রিনল্যান্ড। এখানেও প্রতি দশকে উষ্ণতা বাড়ছে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এভাবে চললে আগামী ১০০০ বছরে হারিয়ে যাবে গ্রিনল্যান্ড। গলছে আলাস্কার হিমবাহ। সুমেরুর জমাট তুষারও গত ৩০ বছরে ৩০ শতাংশে পাতলা হয়ে গিয়েছে। এভাবে চললে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ গ্রীষ্মকালে সুমেরু হয়ে যাবে বরফশূন্য। বিজ্ঞানীরা হিশেব করে বলছেন, আর ১৫-২০ বছরের মধ্যে আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারোর সব বরফ শেষ হয়ে যাবে। আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট কেনিয়ার ৯২ শতাংশে বরফ গত ১০০ বছরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পশ্চিম সাইবেরিয়ায় পুরু বরফ স্তরের নিচে ৭০ মিলিয়ন টন মিথেন গ্যাসের বিশাল এক ভাণ্ডার রয়েছে। গত ৪০ বছরে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেড়েছে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে বরফ গলে তৈরি হচ্ছে হ্রদ। এভাবে যদি বরফ গলতে থাকে তবে অচিরেই এই বিপুল পরিমাণ মিথেন বায়ুতে মিশবে। এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা আরও বাড়বে।

শুধু সুমেরু, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা, আফ্রিকা বা সাইবেরিয়ায় নয়, খোদ ভারতে হিমাচল প্রদেশের বাশপা অববাহিকার চারটি হিমবাহ বিপজ্জনক ভাবে গলছে। ওই এলাকার আরও পনেরোটি হিমবাহ বিপন্নপ্রায়। আবহাওয়া যদি এমনই থাকে তবে বিজ্ঞানীদের অনুমান, ২০৪০ সালের মধ্যেই সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হিমবাহ চারটি সম্পূর্ণ গলে যাবে। গঙ্গা নদীর উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রতি বছর ২৩ সেন্টিমিটার করে পিছিয়ে যাচ্ছে। স্যর এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে যে খুম্বু হিমবাহের উপর দিয়ে এভারেস্ট অভিযান শুরু করেন তা গত ৩০ বছরে ৭ কিলোমিটার পিছিয়ে গেছে। এর ফল হতে চলেছে মারাত্মক। উত্তর ভারতের প্রায় সব নদীরই জলের মুখ্য উৎস হল হিমালয়ের হিমবাহ-গলা জল। প্রথম দিকে হিমবাহের দ্রুত গলনের জন্য নদীতে জলপ্রবাহ বাড়বে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। উত্তর ভারতের নদীগুলোতে গত ৩০ বছরে জলস্রোত বেড়েছে ৭৫ শতাংশে। কিন্তু হিমবাহ যতই নিঃশেষ হয়ে আসবে নদীগুলো ততই শুকিয়ে যেতে থাকবে। উত্তর ভারতের নদীগুলোর এখন ভরা যৌবন দেখে সারা ভারতে নদী জুড়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা তাতে প্রশ্নচিহ্ন জুড়ে দিয়েছে এই সাম্প্রতিক তথ্য। চিনা বিশেষজ্ঞরাও বলেছেন, কিংহাই-তিব্বত মালভূমিতে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের হিমবাহগুলো দ্রুত গলতে থাকবে। ফলে ব্রহ্মপুত্র নদে ঘন ঘন বন্যা দেখা দেবে। এতে অসমের চা শিল্প এবং চা শিল্পে যুক্ত অসংখ্য শ্রমিক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উষ্ণায়নের আর এক মারাত্মক প্রভাব পড়েছে পানীয় জলের ভাণ্ডারে। পৃথিবীর মোট জলের মাত্র ২.৫ শতাংশে হল পানযোগ্য। এর মধ্যে ৬৮.৯ শতাংশে মেরু প্রদেশ ও পর্বত শিখরে বরফ হয়ে জমে আছে। হ্রদ ও নদীতে আছে মাত্র ০.৩ শতাংশে। আর ভূ-গর্ভে ৩০.৮ শতাংশে। কিন্তু দূষণ এবং তজ্জনিত উষ্ণায়নের প্রভাবে ভূগর্ভ ও হ্রদ-নদী-নালা-জলাশয়ে মিঠি জলের পরিমাণ বিপজ্জনক ভাবে কমছে। বিশ্বের ৮০টি দেশ এখন তীব্র জলসংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এইসব দেশের ১২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ জল থেকে বঞ্চিত। এমনটা চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশে মানুষ তীব্র জল সংকটের সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে উষ্ণায়নের প্রভাবে বাড়বে অনাবৃষ্টি, খরা। তৃণ-গুল্ম যাবে শুকিয়ে। বেড়ে চলবে মরু এলাকা। গত ৫০ বছরে সাহারা মরুভূমি ৬৫ বর্গ কিলোমিটারের বেশি জমি গ্রাস করেছে। টিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো ও লিবিয়াতে ১৯৫০ সালের পর এক লক্ষ হেক্টর জমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। রাজস্থানের থর মরুভূমি প্রতি বছর ৮ কিলোমিটার করে এগিয়ে আসছে এবং প্রতি বছর গড়ে ১৩ হাজার হেক্টর জমি গ্রাস করছে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বদলে যাচ্ছে এই নীল গ্রহের আবহাওয়া। বাড়ছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা। ক্যাটারিনা, উইলমা, রিটা ইত্যাদি ঝড় তাণ্ডব চালিয়ে ধ্বংস করেছে আমেরিকার উপকূলবর্তী বহু এলাকা। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে আঘাত হেনেছিল বিধ্বংসী হ্যারিকেন। ওই বছরই নভেম্বরে ভয়াবহ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় 'সিডার'-এর তাণ্ডবে বাংলাদেশে সাড়ে তিন হাজার মানুষ মারা যায়, কুড়ি হাজার মানুষ গৃহহারা হয় ও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। ওই 'সিডার'-এর

এর পর আটের পাতায়

সাতের পাতার পর

তাওবে বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের এক-চতুর্থাংশে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ২০০৩ সালে চেরাপুঞ্জি যে প্রায় বৃষ্টিহীন ছিল তা-ও এই উষ্ণায়নের প্রভাব বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বাড়ছে দাবানল। ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রায়শই দাবানল লাগছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে আরও বেশি কার্বনডাইঅক্সাইড সংযোজিত হচ্ছে। বাড়ছে জীবাণুর সংখ্যা। বাড়ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা রোগ। কারণ, পরিবেশ বদলালে সবার আগে ও সবচেয়ে ভালভাবে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয় জীবাণুরাই।

পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়লে মেরুপ্রদেশের বরফ যে গলে যেতে থাকবে তা বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু তার সাথে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে ওই বরফগলা জলে অ্যাসিডের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। এর ফলে ভূত্বকের জলের অম্লত্ব বেড়ে যাবে। জীবের জীবনধারণ ও কৃষিকাজের পক্ষে এই জল হয়ে উঠবে অযোগ্য। সমুদ্রের জলতল বেড়ে গেলে জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যাবে পৃথিবীর সমস্ত নিচু দ্বীপ ও উপকূল এলাকা। যেভাবে ডুবে গিয়েছে সুন্দরবনের লোহাচড়া ও সুপারিভাঙা দ্বীপদুটি। আর নিশ্চিহ্ন প্রায় ঘোড়ামারা দ্বীপ। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে সমুদ্রে চিরতরে হারিয়ে যাবে সুন্দরবনের আরও ১১টি দ্বীপ।

উষ্ণায়নের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জীববৈচিত্র্য। চর্মচক্ষে তা মালুমও হচ্ছে। ১০-১৫ বছর আগে আলিপুর চিড়িয়াখানা ও সাঁতরাগাছি ঝিলে যত পরিযায়ী পাখি শীতকালে আসত এখন তার সিকিভাগও আসে না। সম্প্রতি বজবজ-বিড়লাপুর অঞ্চল থেকে মিলেনিয়াম পার্ক পর্যন্ত গঙ্গার পূর্ব পাড়ে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আবির্ভাব বুঝিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার লবণাক্ততা বাড়ছে। এতে গঙ্গার স্বাভাবিক জীববৈচিত্র্য যে বিপন্ন হবে, বলা বাহুল্য। সুন্দরবনে কমছে বাঘের সংখ্যা। খাদ্যাভাবে বাঘ প্রায়শই হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। গঙ্গায় ইলিশও হয়ে উঠছে দুর্লভ। বিপন্ন মেরুপ্রদেশ। সেখানে মেরু ভালুকের সংখ্যা কমছে বিপজ্জনক হারে। দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইনের সংখ্যা গড়ে ৪৭ শতাংশ হারে কমছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বহু কীট-পতঙ্গ, মাছ, কচ্ছপ, পাখিদের খাদ্য ও বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে বিপন্ন হতে বসেছে তাদের অস্তিত্ব। উষ্ণতার ক্রমবৃদ্ধিতে বদলে যেতে পারে মৌসুমি বায়ুর গতিপথ। গবেষকদের মতে, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ধ্বংস হয়েছিল সিন্ধু, মায়া, আজটেক সহ পৃথিবীর ১০টি প্রধান প্রাচীন সভ্যতা। আজকের আধুনিক মানব সভ্যতাও বোধহয় সেইরকম ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

গ্রিন হাউস এফেক্ট সহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ৩ থেকে ১৪ জুন ব্রাজিলের রিয়ো ডি জেনিরো শহরে ১৫৪টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বসুন্ধরা সম্মেলন হয় তাতে **ইউ এন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ** নামক চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৫৪টি দেশ। এই চুক্তি অনুসারে দেশগুলি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ১৯৯০ সালে যা ছিল ২০০০ সালেও তাই-ই রাখতে রাজি হয়। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জাপানের কিয়োটো শহরে বসুন্ধরা সম্মেলনে স্থির হয় ২০০২ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫ শতাংশ কমাতে হবে। চুক্তিতে ১৭৮টি দেশ স্বাক্ষর করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে স্বাক্ষর করেনি। তাদের বক্তব্য, চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে তাদের দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমেরিকার সেনেট হাউসও ৯৫-০ ভোটে এই চুক্তির বিরুদ্ধে মত দেয়। মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা-ই বলুক, এই গোঁয়ার্তুমির কারণ অন্য। চুক্তি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পাঁচ বছর পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই পাঁচ বছর তারা ইচ্ছে করলে কোনও পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা না-ও নিতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও চিনকে এই ছাড়ের আওতার বাইরে রাখার জন্য চাপ দিচ্ছে। সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ১০৩ কোটির ভারত দায়ী যেখানে মাত্র ৪ শতাংশ, ১৩০ কোটির চিন দায়ী মাত্র ৭ শতাংশ, সেখানে ২৯ কোটির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী ২৫ শতাংশ।

একজন মার্কিন নাগরিক পিছু যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হয় তা ১৯ জন ভারতীয় নাগরিকের সমান। তা-ও তো ইরাক ও আফগানিস্তানের ওপর গা-জোয়ারি হানাদারির ফলে ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়ামের বিকিরণ থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আমেরিকার ভূমিকা মেপে দেখা হয়নি। আমেরিকা অন্য দেশকে বলছে, 'পরমাণু অস্ত্র সম্ভার কমাও', অথচ নিজেরা ক্রমাগত পরমাণু অস্ত্র সম্ভার গড়ে চলেছে। এ থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা কতটা বাড়ছে তার তো কোনও পরিমাপ হয়নি। সুতরাং এই 'হোয়াইট হাউস এফেক্ট' রোধ করা না গেলে গ্রিন হাউস এফেক্ট রোধ করা কখনোই সম্ভব নয়। মার্কিন দাদাগিরি যতদিন থাকবে ততদিন পরিবেশ বিজ্ঞানীদের 'গ্লোবাল ওয়ার্নিং' দেওয়াই সার হবে, ঠেকানো যাবে না গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

আমাদের প্রকাশিত বই

১. **ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট** (১৯৯২)।
২. **দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট : উপেক্ষিত পরিবেশ** (১৯৯৮)।
৩. **রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস** (২০০৩)।
৪. **অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা** (২০০৩)।
৫. **পরিবেশ** (২০০৩)।
৬. **ধূসর বসুধা** (২০০৩)।
৭. **এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং** (২০০৫)।
৮. **এত আঁধার কেন** (২০০৮)।
৯. **প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ** (২০০৮)।
১০. **প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ** (২০০৮)।
১১. **শিকড়ের সন্ধানে : হুগলি জেলা** (২০০৯)।
১২. **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা** (২০০৯)।
১৩. **জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত** (২০০৯)।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৯৪৬১২০; ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in